সংবাদ

তারিখ 13 DEC 2017 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ঝরে পড়া রোধে শিক্ষক অভিভাবক ও ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আন্তরিক হতে হবে

মো. নূরুল আমিন

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। সরকার ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষ হতে ১ম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত সব স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছে। বৃত্তি-উপবৃত্তি দেয়া সম্প্রসারণ করা হয়েছে, মিড ডে মিলের মতো ব্যাপক ব্যয়বহুল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে, ঝরে পড়ার হার পূর্বের তুলনায় অনেক কমেছে।

ব্যানবেইসের ২০১৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ১৯%, মাধ্যমিক স্তরে ৩৮.৩০% এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০%। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে এ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হলে ১৯০ জন ঝরে পড়ে, মাধ্যমিকে এক হাজার ভর্তি হলে ৩৮৩ জন ঝরে পড়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এক হাজার ভর্তি হলে ২০০ জন ঝরে পড়ে। এই ঝরে পড়া কোন অবস্থায় কাম্য নয় এবং এটি রোধ করতে না পারলে সরকারের যে লক্ষ্য 'সবার জন্য শিক্ষা' তা অর্জিত হবে না। এ হার আরও কমাতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক হতে হবে।

২০১৩ সালে বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার থাকা অবস্থায় হঠাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে একটি শ্রেণীকক্ষে ঢুকে দেখেছি, চক/ডাস্টার, বই, পাঠ পরিকল্পনা/উপকরণ ছাড়াই পাঠদান করতে শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে গিয়েছেন, ধরে নেয়া যায়, তিনি কোন প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই শ্রেণীকক্ষে গিয়েছেন। পাঠ পরিকল্পনা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে গেলে তিনি পরিকল্পিতভাবে ক্লাসটি নিতে পারতেন। কোথা থেকে শুরু করবেন, কোন কোন শব্দ বা বাক্যের প্রতি গুরুত্ব দিবেন, সে অনুযায়ী পাঠদান করতে পারতেন। শ্রেণী শিক্ষক বাংলাদেশ বিষয়ে পাঠদানকালে যদি বাংলাদেশের মানচিত্র শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করেন, মুক্তিযুদ্ধ পাঠদানকালে যদি একজন বীরশ্রেষ্ঠের ছবি দেখান তাহলে পাঠটি যেমন আকর্ষণীয় হবে, ঠিক একইভাবে শিক্ষার্থীর মনে তা অনেক দিন থাকবে।

আমার ছোট ছেলে মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ে। সে একদিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে আমার মোবাইল ফোনে এসএমএস চলে আসে, আপনার সন্তান স্কুলে আসেনি। আমার বড় ছেলে ঢাকা কমার্স কলেজে পড়া অবস্থায় একবার বরিশালে গিয়ে ঝড়ের কারণে দু'দিন কলেজে যেতে পারেনি। তৃতীয় দিন সে কলেজে উপস্থিত হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে ক্লাসে ঢুকতে দেয়নি। আমি অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়টি নিশ্চিত করলে কর্তৃপক্ষ তাকে ক্লাস করার সুযোগ দেয়। প্রশ্ন জাগে, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় বা কমার্স কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো একটু কঠোর হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে আনতে পারলে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো পারছে না কেন?

আজও আমার মনে পড়ে চাঁদপুর কলেজে বাংলা বিষয়ে পাঠদান করতেন শিক্ষক আবদুস সাত্তার। তিনি যখন শ্রীকান্ত পাঠদান করতেন তখন যে অভিনয় করে দেখাতেন তা দেখার জন্য তার ক্লাসে আমরা সবাই দল বেঁধে উপস্থিত থাকতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র থাকাকালে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য আমাদের ক্লাস নিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় বিকেলে ক্লাস নিতেন। তিনি বলতেন, যে সব ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে যাবে তারা যেন যাবার সময় তার অনুমতি ছাড়াই উঠে চলে যায়। তার ক্লাস নেয়ার সময় ৪০ মিনিট থাকলেও তিনি প্রায় এক/দেড় ঘণ্টা ক্লাস নিতেন। তবুও কোন ছাত্রছাত্রী বাসে যাবার জন্য উঠে যেত না। এমনকি তার পরীক্ষার জন্য বাসায় গিয়ে আর পড়তে হতো না। পাঠদানে যদি এমন আকর্ষণ থাকে তাহলে কি শ্রেণীকক্ষ থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়তে পারে?

নেপালে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কার্যক্রমে দেখেছি, শিক্ষার্থীদের কিভাবে বাঁশি বাজিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়। ক্লাস শেষে কীভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পৌঁছে দেন। নেপালে পিটিএ কমিটি রয়েছে, সে কমিটির একজন সদস্য প্রতিদিন স্কুলে উপস্থিত থাকেন। শিক্ষার্থী কেন শ্রেণীকক্ষে আসলো না, তা খোঁজ নেন এবং শিক্ষার্থীকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। এমনকি নেপালে বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক না আসলে ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি শিক্ষককে অন্যত্র বদলি বা শাস্তির ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন তাহলে কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। আমাদের দেশের স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকা উচিৎ।

সিঙ্গাপুরে স্কুল পরিদর্শনে দেখেছি, শ্রেণীভিত্তিক না হয়ে বিষয়ভিত্তিক ক্লাস হয়ে থাকে। শ্রেণীকক্ষে ক্লাস ও বিষয় সম্পর্কিত সব উপকরণ সাজানো থাকে। ফলে শ্রেণী কক্ষের জন্য বই বা উপকরণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বাইরে থেকে আনতে হয় না। সংস্কৃতি বিষয়ের একটি কক্ষে গিয়ে দেখেছি, গান-বাজনার জন্য সব উপকরণ ক্লাসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে যে বিষয়টি আমাকে অবাক করেছে সেটি হলো– সব শিক্ষার্থীই দেখতে প্রায় একই রকম। মনে হয় সবাই একই বাবা-মায়ের সন্তান। বুঝতে পারি, সেদেশে সব শিক্ষার্থীর খাবারের মান, পরিমাণ প্রায় একই হওয়ায় পুষ্টিহীন কোন শিক্ষার্থী যেমন নেই তেমনি সবার স্বাস্থ্যগত কাঠামোও প্রায় এক।

আমি যখন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর দায়িত্বে, তখন শিক্ষার্থীদের গল্প বলা, গল্প লেখা ও বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ইউনিসেফ এবং জিওবি এর অর্থায়নে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে আকর্ষণীয় ছবিসহ বই দেয়া হয়েছিল, বইগুলো প্যাকেটে করে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। একই বছর আমি যখন জেলা প্রশাসক হয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলাম, দেখলাম সে বইগুলো প্যাকেট করা অবস্থায়ই রয়েছে অর্থাৎ বইগুলো শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য দেয়া হয়নি। একজন প্রাঃ বিঃ প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানালেন, বইগুলি শিশুরা নষ্ট করে বা হারিয়ে ফেলতে পারে সেজন্য দেননি। ২০০৯ সালে নেত্রকোনা জেলায় জেলা প্রশাসক থাকাকালে হাওর এলাকায় গিয়ে দেখেছি, শিক্ষকগণ স্কুলে আসেন না, ছাত্রদের উপস্থিতিও নগণ্য। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ছিল একজন ভদ্রমহিলা, দায়িত্ব পালনে আন্তরিক। তাকে বললাম, আমি স্কুলগুলো প্রায়ই পরিদর্শন করবো, যেখানে অনিয়ম পাব আপনাকে জানাব, আপনি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। যেমন কথা তেমন কাজ। প্রতি শনিবার স্কুল পরিদর্শন করতাম। যেখানে শিক্ষকদের অনুপস্থিত পেতাম, তাৎক্ষণিকভাবে তাকে জানাতাম। তিনি কারণ দর্শানোসহ সাময়িক বহিষ্কার করতেন। দেখা গেল, কয়েক মাসের মধ্যে শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত, শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত। অর্থাৎ আন্তরিকভাবে কাজ করলে সবই করা সম্ভব।

সরকার এখন মিড ডে মিল দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের। যে সব স্কুলে দেয়া হয়, সে সব স্কুলে শিক্ষার্থী বেশি। আর যে স্কুলে দেয়া হয় না, সে সব স্কুলে ঝরে পড়ার হার বেশি। সরকারের বই বিতরণ কার্যক্রম ঝরে পড়া রোধে একটি বিরাট সাফল্য। আগে বাবা-মা কবে বই কিনে দেবে, সে জন্য শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়ায় বিলম্ব হতো। আর এখন বছরের প্রথম দিনই সব শিক্ষার্থী বই পাচ্ছে। অর্থাৎ বই এর জন্য চিন্তা করতে হচ্ছে না। স্কুলের উন্নয়ন হয়েছে, এখন কোন কোন স্কুলে ছাত্রদের জন্য একটি, ছাত্রীদের জন্য একটি এবং শিক্ষকদের জন্য একটি পৃথক টয়লেট রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে রয়েছে টিউবওয়েল। কি ভাগ্য শিক্ষার্থীদের, এখন তারা দালানে বসে ক্লাস করছে।

এখন শুধু প্রয়োজন শিক্ষক, অভিভাবক ও ম্যানেজিং কমিটির আন্তরিকতা। যদি শিক্ষকগণ যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন, পাঠ পরিকল্পনা ও উপকরণ নিয়ে শ্রেণীকক্ষে যান এবং আকর্ষণীয়ভাবে পাঠদান করেন তাহলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া অনেক কমে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়াও যদি ম্যানেজিং কমিটি নিয়মিত মা সমাবেশ করে, অভিভাবক সমাবেশ করে বাল্যবিবাহের কুফলগুলো মায়েদের এবং শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলেন তাহলে বাল্যবিয়েজনিত ঝরে পড়ার হার কমে আসবে। মিড ডে মিল কর্মসূচি সম্প্রসারণ, চর ও পাহাড়ি এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, ইভটিজিং বন্ধে সামাজিক আন্দোলন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে পর্যাপ্ত খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে।

[লেখক : প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক]